সড়ক নির্মাণে ব্যক্তিমালিকানাধীন জমির গর্ত কেটে সড়কের মাটি ভরাট, ঝুঁকিতে শতাধিক পরিবার

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় সড়ক নির্মাণ কাজে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে বাইরে থেকে মাটি সংগ্রহ না করে ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি কেটে সেই মাটি সড়কের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে সড়কের দু’ধারে বসবাসরত শতাধিক পরিবার চরম ভোগান্তি ও নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে।

সরেজমিন ঘুরে ও স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গাড়াগঞ্জ বাজার থেকে শৈলকুপা শহর পর্যন্ত প্রায় ৬ কিলোমিটার সড়কের উন্নয়ন কাজ চলছে। কিন্তু প্রায় ৫ কিলোমিটার অংশে নিয়ম না মেনে পাশের জমি থেকে গভীর গর্ত করে মাটি কেটে নেওয়া হয়েছে।

কোথাও কোথাও এই গর্ত এতটাই গভীর যে, তা এখন স্থানীয়দের জন্য ‘মৃত্যুফাঁদে’ পরিণত হয়েছে।

ভুক্তভোগীদের অভিযোগ,তাদের অনুমতি ছাড়াই জোরপূর্বক জমিতে প্রবেশ করে মাটি কেটে নেওয়া হয়েছে। বাধা দিলে উল্টো প্রভাব খাটিয়ে কাজ চালিয়ে যায় সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বসতভিটা, নষ্ট হয়েছে চলাচলের পথ, তৈরি হয়েছে ভয়াবহ ঝুঁকি। বিশেষ করে আসন্ন বর্ষা মৌসুমকে ঘিরে ভূমিধসের আশঙ্কা বেড়েছে।

উপজেলার বারইপাড়া গ্রামের বাসিন্দা জরিনা খাতুন বলেন,’আমার একমাত্র জমিটাই শেষ করে দিয়েছে। বাড়িতে ঢোকা-বের হওয়া দায় হয়ে গেছে। স্বামীর ভ্যান বাড়িতে তুলতে এখন দুই-তিনজন লাগে। এমন কষ্টে কখনো পড়িনি।’

একই গ্রামের আকলিমা খাতুন বলেন,‘ঘরের সাথেই বড় গর্ত করা হয়েছে। বৃষ্টিতে ঘর ভেঙে গর্তে পড়ে যাওয়ার ভয়ে আছি। ঠিকাদারকে একাধিকবার বারণ করলেও শোনেনি।’

মাজেদা খাতুন নামে এক নারী বলেন,‘ঘরের সাথেই বড় গর্ত করা হয়েছে। বাড়িতে ছোট ছোট বাচ্চা আছে। বৃষ্টি হলেই গর্তে পানি জমবে। তখন বাচ্চারা গর্তে পড়ে বড় দুর্ঘটনা ঘটার ভয়ে আছি।’

একই অভিযোগ করেন সড়কের ধারে বসবাসরত আরও অনেকে। তাদের দাবি,কোনো ধরনের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি; বরং প্রভাব খাটিয়ে জোরপূর্বক মাটি কেটে নেওয়া হয়েছে।

সওজ সূত্রে জানা গেছে,সড়কটির মূল ঠিকাদার ঝিনাইদহের মিজানুর রহমান মাসুম। তার কাছ থেকে সাব-ঠিকাদারি নিয়ে কাজ করছেন শৈলকুপার বাইরপাড়া গ্রামের চুন্নু শেখ। ৬ কিলোমিটার সড়কটির নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে ১৬ কোটি ২১ লাখ ৭৯ হাজার টাকা। এর মধ্যে সড়কের দু’ধারে মাটি ভরাট বাবদ বরাদ্দ রয়েছে ২৫ লাখ টাকা।

অনিয়মের বিষয়ে জানতে চাইলে সাব-ঠিকাদার চুন্নু শেখ বলেন,’সমস্যার কথা কেউ আমাকে বলেনি। যেখানে সমস্যা হয়েছে,অভিযোগ পেলে গর্ত ভরাট করে দেওয়া হবে। এই ঘটনায় আমাকে নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করার কিছু নেই। একসময় আপনার সাথে দেখা করবো। পরে এই প্রতিবেদকের অফিসে এসে তাকে টাকা দিয়ে ম্যানেজ করার চেষ্টা চালান চুন্নু শেখ।

সড়ক নির্মাণ কাজের মূল ঠিকাদার মিজানুর রহমান মাসুম বলেন,‘আমার কাছ থেকে সাব ঠিকাদারি নিয়েছেন বারইপাড়া গ্রামের চুন্নু শেখ। এলাকায় প্রভাবশালী হওয়ায় অনিয়ম করলেও তার বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নেই।’

এদিকে সড়ক ও জনপথ বিভাগের (সওজ) নির্বাহী প্রকৌশলী মো. হাফিজুর রহমান বলেন,’ ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি থেকে মাটি কেটে সড়ক নির্মাণের কোনো সুযোগ নেই। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

স্থানীয়দের অভিযোগ ও দাবি,নির্ধারিত বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও নিয়ম না মেনে এভাবে জমি কেটে মাটি নেওয়া দুর্নীতিরই অংশ। দ্রুত গর্ত ভরাট, ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তারা।

জলবায়ু পরিবর্তনে স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে উপকূলীয় নারী

উন্নত বিশ্বের নারী যখন মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার জন্য নভোচারী প্রশিক্ষণ করছে, তখন আমার উপকূলের কোনো অন্তঃসত্ত্বা নারী সন্তান প্রসবের জন্য ২ ঘণ্টার নদী পথ পাড়ি দেওয়ার আশঙ্কায় ভুগছেন; সুস্থভাবে বাচ্চার জন্ম হবে তো! তিনি নিজে বাঁচবেন তো! নাকি অন্যদের মতো প্রসব-পরবর্তীকালীন জটিলতা বয়ে বেড়াবেন আজীবন। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যে ভরপুর, কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের মারাত্মক প্রভাবে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় পরিণত হচ্ছে।

এ অঞ্চলের মানুষের জীবন-জীবিকা আজ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে নারীসমাজ- বিশেষত গর্ভবতী, দুগ্ধদায়ী মা ও কিশোরীরা। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সৃষ্ট লবণাক্ততা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, সুপেয় পানির সংকট, অপুষ্টি ও মানসিক চাপ তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

বাংলাদেশের ১৯টি জেলা উপকূলীয় অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত। এর মধ্যে সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী, লক্ষিপুর, বরগুনা, ভোলা, নোয়াখালী ও কক্সবাজার বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এই অঞ্চলে ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও বন্যা দেখা দিচ্ছে। একই সঙ্গে ভূগর্ভস্থ পানিতে লবণাক্ততা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, অনেক স্থানে পানযোগ্য পানি পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে নারীর মৌলিক চাহিদার ওপর।

পরিবারে পানির যোগান, রান্না, সন্তান লালন-পালন ও দৈনন্দিন গৃহকর্মে প্রধান ভূমিকা পালন করেন নারীরা। ফলে পানির সংকট, খাদ্যাভাব বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের অভিঘাত তারা সরাসরি বহন করেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, উপকূলীয় অঞ্চলে দীর্ঘদিন লবণাক্ত পানি পান করার ফলে উচ্চ রক্তচাপ, প্রসূতি জটিলতা, ত্বকজনিত রোগ ও কিডনি সমস্যা দেখা দিচ্ছে। গবেষণায় দেখা গেছে, উপকূলীয় অঞ্চলের গর্ভবতী নারীদের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপের প্রবণতা সমভূমির নারীদের তুলনায় দ্বিগুণ বেশি। গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত লবণাক্ত পানি পান করলে প্রি-

এক্লাম্পসিয়া ও এক্লাম্পসিয়ার মতো প্রাণঘাতী রোগ দেখা দিতে পারে, যা মা ও নবজাতকের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। এছাড়া লবণাক্ত পানিতে গোসল করার কারণে অনেক নারীর ত্বক পুড়ে যায়, চুল পড়ে যায় এবং চুলকানিসহ নানা চর্মরোগে ভোগেন।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে উপকূলে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। লবণাক্ত মাটি ও পানির কারণে ধান, শাকসবজি ও ফলমূল উৎপাদন কমে গেছে। ফলে খাদ্যে বৈচিত্র্য হারিয়ে যাচ্ছে, বাড়ছে অপুষ্টি। অপুষ্টি নারীর রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে রক্তশূন্যতা ও অকাল বার্ধক্য দেখা দিচ্ছে। উপকূলীয় অঞ্চলে নিরাপদ পানির অভাব এখন একটি বড়ো স্বাস্থ্যঝুঁকি। লবণাক্ত পানির কারণে টিউবওয়েল ও পুকুরের পানি প্রায় অযোগ্য হয়ে পড়ছে। নারীরা প্রতিদিন কয়েক কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে মিষ্টি পানি সংগ্রহ করে। এই পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি, শরীরিকচাপ এবং ভারি জলের পাত্র বহন করার ফলে কোমর ব্যথা, পিঠ ব্যথা, এমনকি গর্ভপাতের মতো জটিলতা দেখা দেয়। এছাড়া, ঘূর্ণিঝড় বা জলোচ্ছ্বাসের পর যখন আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিতে হয়, তখন পর্যাপ্ত টয়লেট ও স্যানিটেশন না থাকায় নারীদের স্বাস্থ্য ও মর্যাদা দুটিই হুমকির মুখে পড়ে। অনেক সময় মেয়েরা রাতে টয়লেট ব্যবহারের ভয়ে পানি না খেয়ে থাকে, ফলে তাদের প্রস্রাবের সংক্রমণ ও কিডনি সমস্যা দেখা দেয়।

জলবায়ু বিপর্যয়ে নারীরা শারীরিক ও মানসিক দু‘দিক থেকে বড়ো আঘাত পায়। ঘূর্ণিঝড় সিডর, আইলা, রোয়ানু বা আম্পানের পর বহু নারী তাদের ঘরবাড়ি, সম্পদ ও প্রিয়জন হারিয়েছে এবং দুর্যোগে বহু পুরুষ শহরমুখী শ্রমবাজারে চলে যায়, ফলে তখন তাদের কাঁধে পড়ে পরিবার টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব। এ চাপ, দারিদ্র্য ও অনিশ্চয়তার কারণে অনেক নারী হতাশায় ভোগেন। গবেষণায় দেখা গেছে, উপকূলীয় অঞ্চলের নারীদের মধ্যে ডিপ্রেশন, অ্যাংজাইটি ও ট্রমাজনিত মানসিক ব্যাধির হার ক্রমবর্ধমান। কিন্তু এখনো মানসিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রামীণ পর্যায়ে প্রায় অনুপস্থিত। সামাজিক কাঠামো ও লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের কারণে নারীরা পুরুষদের তুলনায় বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন। দুর্যোগের সময় আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপত্তাহীনতা, স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চনা ও আর্থিক অস্বচ্ছলতা তাদের সংকটে ফেলে। ঘূর্ণিঝড়ের সময় অনেক নারী সংস্কার বা লজ্জা-সংকোচে আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে চান না, ফলে প্রাণহানির ঝুঁকি বাড়ে। এছাড়া পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ কম থাকায় জলবায়ু অভিযোজন প্রক্রিয়ায় তাদের মতামত প্রায়শই উপেক্ষিত হয়।

[illegible] “Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP)” [illegible], [illegible] “Safe Water Supply in Coastal Belt Project” [illegible], [illegible], [illegible] Climate Resilient Health System [illegible], [illegible]-[illegible] (EmOC) [illegible], [illegible]-[illegible]

[illegible] Gender Action Plan on Climate Change [illegible], [illegible], [illegible]-[illegible], [illegible]-[illegible] (Women Climate Forum) [illegible], [illegible]

[illegible], [illegible]-[illegible] “Standing Orders

on Disaster (SOD)”–এ নারীর নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক নির্দেশনা যুক্ত করেছে। প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে নারীস্বাস্থ্য কর্ণার চালু করা হয়েছে, যেখানে নারী চিকিৎসক ও ধাত্রী দায়িত্ব পালন করেন। আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে স্যানিটারি সামগ্রী ও প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে। দুর্যোগ-পরবর্তী সময় মোবাইল ক্লিনিক ও ফিল্ড হাসপাতাল স্থাপন করা হয়, যেখানে নারীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও পুষ্টি পরামর্শ দেওয়া হয়। জলবায়ু বিপর্যয়ের কারণে অনেক নারী পরিবার ও সম্পদ হারিয়ে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। এ সমস্যা মোকাবেলায় সরকার সম্প্রতি Community Mental Health Programme চালু করেছে। উপকূলীয় জেলা হাসপাতালগুলোতে মানসিক স্বাস্থ্য কর্নার স্থাপন এবং ট্রমা–ভুক্তভোগী নারীদের কাউন্সেলিং সেবা দেওয়া হচ্ছে।

সরকার জলবায়ু-স্বাস্থ্য অভিযোজনে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করছে। UNDP, WHO ও FAO–এর সহায়তায় চলছে “Health Adaptation to Climate Change in Bangladesh” প্রকল্প। Green Climate Fund (GCF) ও World Bank–এর অর্থায়নে উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু সহনশীল হাসপাতাল ও ক্লিনিক নির্মাণ হচ্ছে। “Coastal Embankment Improvement Project (CEIP)”–এর মাধ্যমে উপকূলীয় জনগণের জীবন ও স্বাস্থ্যসুরক্ষা জোরদার করা হয়েছে। নারী ও পরিবার পর্যায়ে জলবায়ু সচেতনতা গড়ে তুলতে সরকার একাধিক কর্মসূচি পরিচালনা করছে—কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে নারীস্বাস্থ্য, নিরাপদ পানি ও পুষ্টি বিষয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা সেশন চালু। স্কুল পাঠ্যক্রমে পরিবেশ ও জলবায়ু শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাতে মেয়েরা ছোটোবেলা থেকেই সচেতন হয়। স্থানীয় রেডিও ও টেলিভিশনে নারীস্বাস্থ্য ও জলবায়ু সচেতনতা বার্তা সম্প্রচার করা হচ্ছে। জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১-তে জলবায়ুজনিত স্বাস্থ্য ঝুঁকি মোকাবিলার নির্দেশনা যুক্ত হয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১–২০২৫) নারী ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে জলবায়ু অভিযোজনকে অন্যতম কৌশল হিসেবে উল্লেখ করেছে। জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (NAP 2023) উপকূলীয় নারীদের নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতে স্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) অর্জনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় নারী-কেন্দ্রিক নীতি অপরিহার্য। নারী কেবল ভুক্তভোগী নয়, বরং পরিবর্তনের চালিকাশক্তি। তাদের অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো অভিযোজন কৌশল সফল হতে পারে না।

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত এখন আর ভবিষ্যতের আশঙ্কা নয়- বর্তমানের একটি কঠিন বাস্তবতা। এর প্রভাব সবচেয়ে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের উপকূলীয় নারীদের জীবনে। তারা প্রতিদিন লড়ছেন দারিদ্র্য, লবণাক্ততা, অপুষ্টি, সুপেয় পানির সংকটের সাথে, অন্যদিকে বারবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাদের মানসিক ও শারীরিকভাবে বিপর্যস্ত করছে।

তবে, নারীরাই আবার ঘুরে দাঁড়ানোর প্রতীক। যতদিন তারা দৃঢ় মনোবলে সংগ্রাম চালিয়ে যাবে, ততদিন উপকূল টিকে থাকবে জীবনের আশায়। এই সংগ্রামকে টেকসই করতে হলে সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসন, নাগরিক সমাজ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আরও নিবিড় সহযোগিতা প্রয়োজন। কেননা, উপকূলের নারী শুধু ভুক্তভোগী নয়-তিনি পরিবর্তনের অগ্রদূত। বর্তমানে রাষ্ট্রীয় নীতি, সরকারি পদক্ষেপ ও স্থানীয় পর্যায়ের উদ্যোগগুলো ধীরে ধীরে পরিস্থিতি পাল্টে দিচ্ছে।

লেখক: সহাকারী তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদপ্তর।

সঠিক সময়ে নির্বাচন না হলে দেশের ভবিষ্যৎ ঝুঁকিতে

বাংলাদেশে নির্ধারিত সময়ে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হলে দেশের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে বলে মন্তব্য করেছেন, বিএনপি’র ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু। তাঁর দাবি, এতে শুধু গণতন্ত্রই নয়, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বও হুমকির মুখে পড়বে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গার মোমিনপুর ইউনিয়নে বিএনপি’র এক পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

শামসুজ্জামান দুদু অভিযোগ করে বলেন, গত ১৬ বছর ধরে আওয়ামী লীগ বিএনপি ও এর নেতাকর্মীদের ওপর ‘অবিরাম নির্যাতন’ চালিয়ে আসছে। তিনি বলেন, “এখনও তারা দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এসব ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে এবং দৃঢ়ভাবে

প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।”

আগামী নির্বাচন নিয়ে দুদু বলেন, দেশের কৃষক, শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের দল বিএনপিকে জয়লাভ করাতে হবে। “ধানের শীষকে বিজয়ী করতে হবে এবং তারেক রহমানকে প্রধানমন্ত্রী বানাতে হবে—এর কোনো বিকল্প নেই।”

পথসভা শেষে শামসুজ্জামান দুদু আলমডাঙ্গা উপজেলার খাসককরা ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে আরও কয়েকটি সভায় অংশ নেন। এ সময় জেলা বিএনপি’র সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ওয়াহেদুজ্জামান বুলা, উপজেলা বিএনপি নেতা আসিরুল ইসলাম সেলিমসহ দলীয় বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এইডস সংক্রমণের ঝুঁকিতে শিক্ষার্থীরা

মানব সভ্যতাকে যে রোগগুলো হুমকির সম্মুখীন করে তুলেছে, প্রাণঘাতী এইডস তার মধ্যে অন্যতম। এটি একটি নীরব ঘাতক। এ রোগের ভাইরাসে আক্রান্ত হলে শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা ধীরে ধীরে ধ্বংস করে দেয়। তখন যেকোনো সংক্রামক জীবাণু সহজেই এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তিকে আক্রমণ করতে পারে। সাম্প্রতিক সময়ে সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে রোগীর সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে, যা স্বাস্থ্য খাতের জন্য নতুন উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। ভারত ও মিয়ানমারের সীমান্ত ঘেঁষা যশোর, চুয়াডাঙ্গা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কক্সবাজারসহ বেশ কয়েকটি জেলায় সংক্রমণের হার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বেশি বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ।

যশোর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে আয়োজিত এক স্বাস্থ্য বিভাগের বৈঠকে জানা যায়, ২০২৪ সালে এ হাসপাতালে এইচআইভি আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ছিল ২৫ জন। চলতি বছরের অর্ধেক সময়েই তা দ্বিগুণ হয়েছে। অর্থাৎ জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত মোট ৩ হাজার ৯১৭

জনের এইচআইভি পরীক্ষা করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩৭ জন নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছেন। আক্রান্তদের মধ্যে ২৩ জন পুরুষ ও ১৪ জন নারী। এর মধ্যে ২৫ জন শিক্ষার্থী, যাদের বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এত সংখ্যক শিক্ষার্থীর আক্রান্ত হওয়া ভবিষ্যতের জন্য বড় হুমকি। একই ধরনের চিত্র দেখা যাচ্ছে কক্সবাজার ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। গত জুন মাসে যশোর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে দ্বিতীয়বার একজন এইডস রোগী সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। কোভিডের সময় এই হাসপাতালেই আরেকজন এইডস রোগী প্রথমবার সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। প্রায় পাঁচ বছর পর একই রোগে আক্রান্ত আরেকজন নারী সন্তান জন্ম দিয়েছেন। এইডস রোগীদের সরকারিভাবে চিকিৎসা ও অন্যান্য সেবা প্রদানের জন্য একটি অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপি (এআরটি) সেন্টার চালু রয়েছে।

স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের মতে, সীমান্তবর্তী এলাকায় মাদক পাচার ও সেবন, অনিরাপদ যৌন সম্পর্ক এবং বিদেশফেরত কর্মীদের মধ্যে সচেতনতার অভাব এ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। বাংলাদেশে এখনও এইচআইভি নিয়ে ব্যাপক কুসংস্কার রয়েছে। অনেকেই পরীক্ষা করাতে চান না, আবার আক্রান্তরাও লুকিয়ে থাকেন। ফলে চিকিৎসা পাওয়া কঠিন হয় এবং সংক্রমণও বেড়ে যায়। যশোরের এক রোগী জানান বিদেশে কর্মরত অবস্থায় ভাইরাসে আক্রান্ত হলেও দীর্ঘদিন তা বুঝতে পারেননি তিনি। দেশে ফেরার পর অসুস্থ হলে পরীক্ষা করে জানা যায়, তিনি এইচআইভি পজিটিভ। কিন্তু সামাজিক লজ্জা ও ভয়ের কারণে তিনি দীর্ঘদিন চিকিৎসা নেননি। ফলে পরিবারের আরও সদস্য সংক্রমণের শঙ্কায় পড়েছেন। এমন ঘটনা সীমান্তবর্তী জেলায় অজস্র, যা প্রকাশ্যে আসছে না শুধুমাত্র সামাজিক চাপের কারণে।

জাতিসংঘের এইডস বিষয়ক সংস্থার (ইউএনএইডস) মতে, বাংলাদেশ এখনও নিম্ন সংক্রমণ হারবিশিষ্ট দেশ হলেও সীমান্তবর্তী এলাকায় আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। এ এলাকার তরুণরা অনেক সময় ঝুঁকিপূর্ণ কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়। যশোর সীমান্তবর্তী জেলা হওয়ায় ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করছে। ভারত থেকে মানুষের অবাধ যাতায়াত, মাদক সেবন ও পাচার, যৌনপল্লির উপস্থিতি এবং নিরাপদ যৌন আচরণের অভাব সংক্রমণ বাড়াচ্ছে। এ ভাইরাস রোগীর দেহ থেকে অন্যের শরীরে ছড়ায় রক্ত ও বীর্যের মাধ্যমে। বীর্যের মাধ্যমে সংক্রমিত হয় বলেই এই রোগকে ‘সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ’ হিসেবে গণ্য করা হয়। এ রোগের লক্ষণগুলোর মধ্যে হলো ঘন ঘন জ্বর হওয়া ও এক-দেড় মাস ধরে একটানা জ্বর। জ্বরের সঙ্গে গলায় অস্বাভাবিক ব্যথা হয়। খাবার খেতে ও গলা

দিয়ে নামতে সমস্যা হয়। প্রায় ৮৮ শতাংশ রোগীর ক্ষেত্রে প্রথম তিন সপ্তাহের মধ্যেই গলায় র্যাশ দেখা দেয়। তীব্র প্রদাহ হতে শুরু করে। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে ঘাম। ঘুমের মধ্যেও তীব্র ঘাম হয়। শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা কমতে থাকে বলে অল্পতেই বমি ভাব ও পেটের সমস্যা দেখা যায়।

বর্তমানে দেশে প্রায় ১৪ হাজারেরও বেশি এইচআইভি আক্রান্ত রোগী রয়েছেন, যার মধ্যে শনাক্তকৃত সংখ্যা তুলনামূলক কম। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, প্রকৃত সংখ্যা এর দ্বিগুণেরও বেশি হতে পারে। এইডস এখন নির্দিষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে তা ধীরে ধীরে সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। আক্রান্ত ব্যক্তির মাধ্যমে এই মরণব্যাধি ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ছে। অনিরাপদ যৌন সম্পর্ক সংক্রমণের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। ইনজেকশনের সুচ ব্যবহার বিশেষত মাদকসেবীদের মধ্যে ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। অভিবাসী শ্রমিক বা বিদেশফেরত কর্মীরা সচেতনতার অভাবে পরিবারে ভাইরাস ছড়িয়ে দিচ্ছেন। সামাজিক লজ্জা ও কুসংস্কারের ভয়ে পরীক্ষা ও চিকিৎসা নিতে মানুষ পিছপা হচ্ছেন।

এইডস একটি প্রাণঘাতী রোগ হলেও, সময়মতো চিকিৎসা ও সচেতনতার মাধ্যমে তা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। আধুনিক কিছু ওষুধে রোগীর জীবন কিছুদিন বাড়ানো গেলেও সেসব চিকিৎসা পদ্ধতি মোটেও মধ্যবিত্তের আয়ত্তে নেই। সরকার বিভিন্ন জেলায় ভলান্টারি কাউন্সেলিং অ্যান্ড টেস্টিং সেন্টার (VCT) চালু করেছে। এইডস আক্রান্ত রোগীদের জন্য বিনামূল্যে ওষুধ ও চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, সারাদেশে ১৩টি হাসপাতালে অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপি (এআরটি) সেন্টার চালু রয়েছে। এর মধ্যে যশোর একটি। যশোরে এইচআইভি পজিটিভ শতাধিক মানুষ রয়েছে। বর্তমানে যশোর সদর হাসপাতালের এআরটি সেন্টারে ২২০ জন এইচআইভি রোগী চিকিৎসা নিচ্ছেন। তাদের মধ্যে যশোর ছাড়াও খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জেলার মানুষ রয়েছেন। এইডস রোগীদের সামাজিক অবস্থান যেন নষ্ট না হয়, সেজন্য আমরা সচেষ্ট আছি। তাদের বিষয়ে গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়। ২০৩০ সালের মধ্যে আক্রান্তদের শতকরা ৯৫ ভাগ চিকিৎসার আওতায় আনার সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে। সরকারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সংস্থা ও এনজিওগুলো মাঠপর্যায়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালাচ্ছে।

এইডস প্রতিরোধে সমগ্র দেশে ব্যাপক সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো খুবই প্রয়োজন। কনডম ও নিরাপদ সুচ ব্যবহারের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। স্কুল-কলেজে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত

করতে হবে। অভিবাসী শ্রমিকদের দেশে ফেরার পর স্বাস্থ্য পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা করতে হবে, কারণ বর বা কনে যদি এই ভাইরাসের বাহক হয়, তবে যৌন সম্পর্কের ফলে অন্যের শরীরে সহজেই প্রবেশ করবে এই ভাইরাস। প্রতিবার ইনজেকশন নেওয়ার সময় নতুন সিরিঞ্জ ও সূচ ব্যবহার করতে হবে। রোগাক্রান্ত প্রসূতির সন্তানের শরীরেও এইডস হতে পারে। সাধারণত ঝুঁকিপূর্ণ যৌন পেশাদারদের ক্ষেত্রে এই রোগের প্রভাব বেশি থাকে। মুমূর্ষু অবস্থায় রক্তের প্রয়োজন হলে অবশ্যই এইডস পরীক্ষা করে শরীরে রক্ত দিতে হবে।

ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর কাছে প্রতিরোধমূলক সেবা পৌঁছে দেওয়া, সহজে টেস্টের সুযোগ তৈরি করা এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের মতে, অনেক রোগী সন্দেহজনক লক্ষণ দেখা দিলেও পরীক্ষার প্রতি অনীহা প্রকাশ করেন, যা প্রতিরোধ কার্যক্রমে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বর্তমানে সরকারের সরবরাহকৃত এআরটি ওষুধ পর্যাপ্ত আছে এবং চিকিৎসা অব্যাহত থাকবে। পাশাপাশি সিভিল সার্জন কার্যালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে সঙ্গে নিয়ে জনসচেতনতা বাড়ানোর মাধ্যমে সংক্রমণ প্রতিরোধে একযোগে কাজ চলছে। অনেক ক্ষেত্রেই সমাজে এইডস সংক্রমণ নিয়ে ভ্রান্ত ধারণা বিরাজ করছে। অনেকেই ভুলভাবে মনে করেন, হাত মেলানো, একই প্লেটে খাওয়া বা পাশে বসে থাকার মাধ্যমে এইচআইভি ছড়ায়—যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এ ধরনের ভুল ধারণা কেবল রোগীদের সামাজিকভাবে আরও কোণঠাসা করে তোলে। এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে উঠা-বসা দোষের নয়। তাদের সঙ্গ দেওয়া যায়। এ ধরনের রোগী নিয়মিত চিকিৎসা নিয়ে স্বাভাবিকভাবে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে পারে।

সীমান্তবর্তী জেলায় রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পুরো দেশের জন্য সতর্ক সংকেত। এইডস প্রতিকারের ব্যবস্থা যেহেতু এখনো অজ্ঞাত, সেহেতু প্রতিরোধই হবে এইডস থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায়। মরণব্যাধি এইডস থেকে বাঁচতে হলে সাধারণ মানুষের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। শুধু অসচেতনতার কারণে আমাদের দেশে এইডসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের এখন থেকেই সচেতন করতে না পারলে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হবে। গণমাধ্যম, পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে একযোগে কাজ করতে হবে। তাই এখনই ব্যবস্থা না নিলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ আরও বড় স্বাস্থ্যঝুঁকির মুখে পড়তে

পারে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকেও এইডস নির্মূলে এগিয়ে আসতে হবে। এইডস প্রতিরোধে গণসচেতনতাই এখন মুখ্য বিষয়। তাই এইডস প্রতিরোধে প্রয়োজন সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং কার্যকর পদক্ষেপ।

লেখক: সহকারী তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদপ্তর